বিধবা বিবাহ সংস্কার আন্দোলন ও বিদ্যাসাগর

ড. রামশঙ্কর প্রধান
সহকারী অধ্যাপক
রামানন্দ সেন্টিনারী কলেজ, পুরুলিয়া।

'উনবিংশ শতাব্দী' সাহিত্য তথা সমাজ ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ন অধ্যায় এবং বাংলা তথা বাঙ্গালির জীবন ও সংস্কৃতির জীবন্ত দলিল। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে রামমোহনের প্রচেষ্টায় সমাজ থেকে শতীদাহ প্রথার অভিশাপ দূরীভূত হয়েছিল।। উচ্চ-নীচ সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সে কালে শতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।। হিন্দু বিধবাদের জোর করে সতী হওয়ার জন্য বাধ্য করা হত ।। কখনো ধর্মীয় কখনো শাস্ত্রের অজুহাত দেখিয়ে বিধবা নারীদের সতী হওয়া যে পূণ্যের কাজ, কিংবা তাতে বংশ মর্যদা বৃদ্ধি পাবে, ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে সে কালে সমাজ পতিগণ বিধবাদের সতী হতে বাধ্য করতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবাকে আফিং বা সিদ্ধি জাতীয় মাদক খাইয়ে আচ্ছন্ন করে রাখা হত এবং হাত পা বেঁধে জোর করে স্বামীর চিতায় তুলে দেওয়া হত। রামমোহন রায় সেই অভিশাপ থেকে বাঙ্গালি সমাজকে নিষ্কলুষ করেছিলেন । আর বিদ্যাসাগর মহাশয় অবিদ্যা ও কুসংস্কারের মূঢ় আবরণ উন্মোচন করে সমাজকে জ্ঞানের আলোকের করুণাধারায় স্নাত করেছিলেন।

পড়াশুনায় সুখ্যাতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবাল্য। মাত্র পনের বছর বয়সে বিদ্যাসাগর মহাশয় অলঙ্কার শ্রেণীতে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের সকল ছাত্র অপেক্ষা সর্বোৎকৃষ্ট হয়ে সর্বপ্রধান পারিতোষিক লাভ করেছিলেন, শুধু তাই নয় বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্য দর্পণ' - 'কাব্য প্রকাশ', 'রস গঙ্গাধর' প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থে তাঁর ব্যুৎপত্তি বিচার করে তৎকালীন বিখ্যাত দর্শন শাস্ত্রবেত্তা জয়নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন মহাশয় বিদ্যাসাগরের সম্পর্কে বলে ছিলেন, - 'এই বালকের বয়োবৃদ্ধি হইলে বাংলা দেশের মধ্যে অদ্বিতীয় লোক হইবে। এত অল্প বয়সে এরূপ সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন লোক আমার কখনও দৃষ্টি গোচর হয় নাই।'[১] এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিশেষ ঘটনার কথা আমাদের স্মরণে আসে, যেদিন ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার বিদ্যাসাগর মহাশয় জন্মগ্রহন করেন, সেই দিনই বিদ্যাসাগরের পিতামহ রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তীর্থক্ষেত্র থেকে ফিরে বালক বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন তাঁর স্ত্রী দুর্গাদেবীর কাছে তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ - 'এই বালক ক্ষণজন্মা অদ্বিতীয় পুরুষ ও পরম দয়ালু হইবে এবং ইহার কীর্তি দীগন্ত ব্যাপিনী হইবে। এই বালক জন্মগ্রহণ করায় আমার বংশের চিরস্থায়ী কীর্তি থাকিবে, ইহাকে দেখিয়া আমি চরিতার্থ হইলাম, এ বালক সাক্ষাৎ ঈশ্বরতুল্য, অতএব ইহার নাম অদ্য হইতে আমি ঈশ্বর চন্দ্র রাখিলাম।'[২] ঈশ্বর চন্দ্র ক্ষণজন্মা এবং উনিশ বিশ শতক নয় আজীবন বাঙ্গালীর অদ্বিতীয় পুরুষ হিসাবে পরিগনিত হবেন ।

পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মাত্র নয় বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় আসেন । ১৮২৯ সালের ১লা জুন কলকাতার পটলডাঙ্গার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। মাসিক বৃত্তি লাভ করে ঈশ্বরচন্দ্র 'ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পন্ডিত হয়েছিলেন।'[৩] ছাত্রাবস্থা থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র পরোপকারী ও দয়ালু ছিলেন। মাসিক যে বৃত্তি পেতেন তা কলেজের ছাত্রদের ও দরিদ্রদের খাওয়া ও বস্ত্র কেনার কাজে ব্যয় করতেন। কলকাতা থেকে দেশে ফিরলে দুস্থ ও গরীবদের বস্ত্র দান করতেন। মাত্র বাইশ বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজ থেকে আইন, বেদান্ত, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়ে তিনি সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি মার্শেল সাহেবের বিশেষ আস্থাভাজন হয়েছিলেন এবং 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেছিলেন। ঐ সময় ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ঈশ্বরচন্দ্র মহাশয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পন্ডিতের পদ অলঙ্করণ করেন, মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কারণে ঈশ্বরচন্দ্র সমাজের বৃহত্তর আঙ্গিনায় প্রবেশ

করলেন।। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অনেক ইংরাজী জানা লোক এদেশীয় ও বিদেশীয় যেমন ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে সংস্কৃত শিক্ষার মানসে উপস্থিত হতেন, তেমনি তত্ত্ববোধিনী সভার মুখ্য প্রচারক অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় সভায় যেসব প্রবন্ধ প্রচার হবে তার পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে নিতে আসতেন। তৎকালের বহু পন্ডিত মানুষ ঈশ্বরচন্দ্রের পান্ডিত্যের ও ব্যক্তিত্বের মহিমায় যেমন নতজানু ছিলেন, তেমনি তার করুণার কিরণে সমগ্র সমাজ স্নাত পুতঃ পবিত্র হয়েছিল সন্দেহ নেই। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী এ প্রসঙ্গে বলেছেন - 'মানব চরিত্রের প্রভাব যে কি জিনিস, উগ্র-উৎকট ব্যাক্তিত্ব সম্পন্ন তেজীয়ান পুরুষগণ ধনবান হীন হইয়াও যে সমাজ মধ্যে কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন তাহা আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয় কে দেখিয়া জানিয়াছি। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মনের সন্তান, যাঁহার পিতার দশ বার টাকার অধিক আয় ছিলনা, যিনি বাল্যকালে অধিকাংশ সময় অর্ধবসনে থাকিতেন, তিনি এক সময় নিজ তেজে সমগ্র বঙ্গসমাজকে কিরূপ কাঁপাইয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে মন বিস্মিত স্তব্দ হয়। তিনি এক সময় আমাকে বলিয়াছিলেন ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই যাহার নাকে এই চটিজুতাশুদ্ধ পায়ে টক করিয়া লাথি না মারিতে পারি। আমি তখন অনুভব করিয়াছিলাম এবং এখনও অনুভব করিতেছি যে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য, তাঁহার চরিত্রের তেজ এমনি ছিল যে তাঁহার নিকট ক্ষমতাশালী রাজারাও নগন্য ব্যাক্তির মধ্যে।'[৪] ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে থাকাকালীন ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীর পদ শুন্য হলে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সে দায়িত্ব ভার নিতে হয় ও পরে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বিদ্যাসাগর কে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে আসীন হতে হয়।।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর একদিকে সংস্কৃত কলেজের নানাপ্রকার সংস্কার, যেমন পুস্তকাদি সংরক্ষণ, ব্রাহ্মন, বৈদ্য ব্যাতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের ছাত্রদের জন্য কলেজে পড়ার অনুমতি পত্র প্রদান, শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ প্রনয়ণ ও শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিকীকরন আনার প্রয়াসে দিনরাত চিন্তা ও পরিশ্রমে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। আবার অন্যদিকে তাঁর বেতাল পঞ্চবিংশতি যেমন বঙ্গে নবযুগের সূচনা করল তেমনি তাঁর 'জীবন চরিত্র', 'বোধোদয়', 'শকুন্তলা'র জনপ্রিয়তা বিদ্যাসাগরের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি জনসমাজে বাড়িয়ে দিল। ইতোপূর্বে সংস্কৃত কলেজের গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয়ের বিশুচিকা রোগের চিকিৎসা ও সেবা করেছেন। দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক জয়নারায়ন তর্ক পঞ্চানন মহাশয়ের ভাগিনেয়র ওলাউঠার খবর পেয়ে বিদ্যাসাগর সমাজের শুচী অশুচীর তোয়াক্কা না করে ডাক্তার ডেকে নিজে তার সেবা করে সুস্থ করে তুলেছিলেন। শুধু পরিচিতই নয়, পরিচিত অপরিচিত যে কেউ অসুস্থকে বিদ্যাসাগার যথাসাধ্য চেষ্টা করে সেবা করে তাদের পুনর্জীবন দান করেছেন, তাই তাঁকে অনেকে দেবতা বলে শ্রদ্ধা করত।। এই সেবা মনস্কতা বিদ্যাসাগরের আবাল্য মনো মধ্যে লালিত হত।। তিনি দুস্থ্য কাউকে দেখলে স্থির থাকতে পারতেন না।। বিদ্যাসাগরের সেবা পরায়নতার কথা বলে শেষ করা যাবে না। ১৮৬৬ সালে দুর্ভিক্ষে যখন খাদ্যের অভাবে মানুষ মৃতপ্রায়, বিদ্যাসাগর কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে নিজ হাতে খাদ্য পরিবেশন করেছেন। বীরসিংহে তিনি ঐ দুর্ভিক্ষের সময় অন্নছত্র খোলার ব্যবস্থা করেন। সমাজে তখন জাতপাতের বাছবিচারের কড়াকড়ি, কিন্তু বিদ্যাসাগর কতটা উদার ও এই সব তুচ্ছ জাত ধর্মের অন্ধকুসংস্কারের উর্ধে উঠে তিনি হাড়ি মুচি ডোম প্রভৃতি নিচু জাতের গরিব দুঃখিনী মেয়েদের রুক্ষ মাথায় নিজ হাতে তেল লাগিয়ে দিয়ে ছিলেন। এই ঘটনা শুনে পরবর্ত্তী কালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বিদ্যাসাগর চরিতে' যে মন্তব্য করেছেন তা আজ একবিংশ শতকেও সমান প্রাসঙ্গিক - 'আমাদের হৃদয় যে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাহা বিদ্যাসাগরের দয়া অনুভব করিয়া নহে - কিন্তু তাহার দয়ার মধ্য হইতে যে একটি নিঃসঙ্কোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব পরিস্ফূট হইয়া উঠে, তাহা দেখিয়া আমাদের এই নীচ জাতির প্রতি চিরাভ্যস্ত ঘৃণাপ্রবন মন ও আপন নিগূঢ় মানব ধর্ম বশতঃ ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া পারে না।।'[৫]

বিদ্যাসাগর ঐ দুর্ভিক্ষের সময় অগনিত মানুষকে জীবন দান করেছিলেন। ব্যক্তিগত ভাবে দেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের সাহায্য ছাড়াও তিনি সর্বসাধারণের কথা ভেবে তদানীন্তন বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনার মনট্রিশর সাহেবের কাছে দরবার করে বহু সরকারী অন্নসত্রের ব্যবস্থা করেছিলেন। মনট্রিসর সাহেব বিদ্যাসাগরকে চিঠি লিখে জানিয়ে ছিলেন - ''The worm acknowledgment of Government for your generous exertious in relieving the poor during the recent scarcity in the hoogly District''[৬] এর পর বিদ্যাসাগর দেশবাসীর কাছে 'দয়ার সাগর' হিসাবে পরিচিত হলেন। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছিলেন - ''অনেক মহৈশ্বর্যশালী রায় বাহাদুর প্রচুর ক্ষমতা লইয়া যে উপাধী লাভ করিতে পারেন নাই, এই দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান (বিদ্যাসাগর) সেই দয়ার সাগর নামে বঙ্গদেশে চিরদিনের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিলেন।''[৭]

শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন - ১৮৫৬ সাল বিদ্যাসাগরের জীবনের শ্রেষ্ট সময়। বিদ্যাসাগর দরিদ্রদের দুঃখ নিবারণের জন্য যেমন নিজের সর্বস্ব পন করতে পারতেন তেমনি সমাজের বিধবা প্রথার নামে অমানবিক কুসংস্কার দূরীকরণের জন্যও হয়েছিলে বদ্ধ পরিকর। কারণ বহু প্রাচীন কাল থেকেই সহমরণ প্রথাকে সমাজ নিজেদের সুবিধার্থে শাস্ত্র সিদ্ধ প্রথায় রূপান্তরীত করে ফেলেছে, এবং বিধবা নারীগণ সমাজের এক কোনে নিদারুণ অবহেলায় জীবনের সুখ সাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে নিঃশেষে জীবন অতিবাহিত করবে এটাই ছিল বিধি সম্মত দস্তুর। উনবিংশ শতাব্দিতে রামমোহনের ন্যায় বিদ্যাসাগরই 'প্রথম পুরুষ' যিনি সমাজের গন্ড প্রদেশে প্রোথিত এই জগদ্দল প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করে বিধবাদের ব্যর্থ জীবনকে সার্থকতায় উন্নীত করে ছিলেন।। বিধবাদের প্রতি সমাজের এই বিরূপ ব্যবহার বিদ্যাসাগরকে অনেক অল্প বয়সে পীড়িত করেছিল তখন বিদ্যাসাগর কলকাতায় পিতার কাছে পড়াশুনার নিমিত্ত থাকতেন, - ''বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি বাল্যসহচরী ছিল। সেই সহচরী তাঁর এক প্রতিবেশীর কন্যা। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে বড় ভালোবাসিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কলিকাতায় পড়িতে আসেন তখন বালিকার বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের কয়েকমাস পরে তাহার বৈধব্য ঘটে। বালিকাটি বিধবা হইবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের ছুটিতে বাড়িতে গিয়াছিলেন। বাড়ি যাইলে তিনি প্রত্যেক প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে জিজ্ঞাসা করিতেন কে কি খাইল ? ইহাই তাঁহার স্বভাব ছিল। এবার গিয়া জানিতে পারিলেন তাঁহার বাল্যসহচরী কিছু খায় নাই, সেদিন তাহার একাদশী ঃ বিধবাকে খাইতে নাই। একথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেদিন হইতে তাঁহার সংকল্প হইল বিধবাদের এ দুঃখ মোচন করিব। যদি বাঁচি তবে যাহা হয়, একটা করিব। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়স ১৩/১৪ বৎসর মাত্র হইবে।''[৮]

বিদ্যাসাগর একক আন্তরিক প্রচেষ্টায় এবঙ্গে নারীশিক্ষার প্রসার ঘটেছিল। পুরুষদের জন্য তো বটেই, শুধু মেয়েদের জন্যই বাংলাদেশে বহু স্কুল তাঁর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরই সঙ্গে সঙ্গে বহু বিবাহ রদ ও বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের সংকল্প রূপায়নের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলাদেশে এক অভিশপ্ত যুগের অবসান ঘটিয়েছিলেন। একদা ভগবতী দেবী ও ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের কোন আত্মীয়ের দ্বাদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যাকে দেখে বিদ্যাসাগরের কাছে আক্ষেপ করে বলেছিলেন ''বিধবা বালিকার পুনর্বার বিবাহ বিধি কি ধর্মশাস্ত্রের কোন স্থলে কিছু লেখা নাই ? শাস্ত্রকারেরা কি এতই নির্দয় ছিলেন?''[৯] পিতামাতার আক্ষেপ বিদ্যাসাগরকে অনন্তর দগ্ধ করেছিল সন্দেহ নেই, সে কারণে তিনি পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ে কে বলেছিলেন যে, বেদ, পুরাণ, স্মৃতি শাস্ত্র পাঠে তাঁর এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সিদ্ধ, এতে কোন সন্দেহ নেই। ইতো পূর্বে ডিরোজিও সাহেবের শিক্ষাগুরু ডেভিড ড্রামড তাঁর সম্পাদিত 'উইকলি এগজামিনার' পত্রিকায় ২রা মে ১৮৪০ সংখ্যায় 'কুলীন ব্রাহ্মণস' নিবন্ধে লিখেছিলেন ''লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক দ্বারা প্রণীত 'সতীদাহ প্রথা' রদকারী আইনটি আজ

সর্বজন প্রশংসিত কিন্তু সবদিক বিচার করে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না, এই প্রথার অবলুপ্তিতে নারী জাতির কোন মঙ্গল হয়েছে কিনা ?

সতীদাহ প্রথার রদ হওয়ার ফলে যে বিধবারা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন, তাদের সমাজ ও সংরারের চোখে সসম্মানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা যদি লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংস্ক ও তার সরকারের দ্বারা সম্ভব হত তবে এই আইনের উদ্দেশ্য ও ফলাফল যথার্থই সুফলদায়ী হত। আজ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে অসহায় বিধবারা অন্তরালবর্তী হয়ে অতিশয় কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন।' ১০

বিদ্যাসাগর বিধবাদের এই অসহায় নিদারুন যন্ত্রণার শরিক হয়ে ছিলেন বলেই প্রথমে 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় 'বাল্য বিবাহের দোষ' প্রসঙ্গে লিখলেন - 'পতি বিয়োগ দুঃখের সহ সকল দুঃসহ দুঃখের সমাগম হয় উপবাস দিবসে পিপাসা নিবন্ধে কিংবা সাংঘাতিক রোগানুবন্ধে যদি তাহার প্রাণাপচয় হইয়া যায় তথাপি নির্দ্দয় বিধি তাহার নিঃশেষ নিরস রসনাগ্রে গন্ডুষমাত্র বারি বা ঔষধ দানের ও অনুমতি দেন না।' ১১ ফলে সমাজ থেকে এই অভিশাপ নির্মূল করতে হলে, যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সমাজপতিগন বিধবাদের নরককুন্ডে নিক্ষেপ করছে, সে শাস্ত্রের বিধানেই যে এর প্রতিকারের কথা আছে তা সমাজ সমক্ষে গোচর করার দায়িত্ব বিদ্যাসাগর নিলেন।। ইতো পূর্বে ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায় 'জ্ঞানান্বেষণ' ও বেঙ্গল 'স্পেক্টেটর' পত্রিকায় ১৮৪২ সাল থেকে বিধবা বিবাহের সপক্ষে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।। বিদ্যাসাগর কয়েক মাস দিবারাত্র শাস্ত্র পাঠের মাধ্যমে সমাজের সামনে উক্ত বিধবা বিবাহের বিধান গোচরীভূত করলেন। ১৮৫৫ সালের কার্তিক মাসে বঙ্গভাষায় অনুবাদ সহ বিধবা 'বিবাহের ব্যবস্থা' পুস্তক প্রচার করেন। 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিৎ কিনা' এই প্রস্তাবে সমগ্র ভারত জুড়ে আন্দোলন আলোচনা চলতে লাগল। কেউ কেউ বিদ্যাসাগরকে কুৎসিৎ গালাগালি ও দিলেন, কিন্তু পুরাকালে বিধবা বিবাহ চালুছিল। শাস্ত্রের কথা 'পরাসর সংহিতা' থেকে উদ্ধৃত করে বিদ্যাসাগর বললেন -

'গতে মৃত প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে।'

এর অর্থ মনে হয় এই রূপ 'Women are ar liberty true marry again if their husbands be not heard of, die retired from the world, proof to be eunuchs of become patitas' (Bengal Spectator 1842)

ধর্মশাস্ত্রের বিচার দিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সেকালের তাবড় তাবড় ধর্মবেত্তার সঙ্গে সমালোচনার ধর্ম যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের জয় হয়েছিল। প্রায় দুই সহস্র লোকের স্বাক্ষর সম্বলিত বিধবা বিবাহের সপক্ষের আবেদন বিদ্যাসাগর মহাশয় জমা করলেন। হোম ডিপার্টমেন্টের স্যার সিসিলি বীডন সাহেবের কাছে এবং সুপ্রীম কাউসিলর মেম্বর হেলিডে সাহেবের কাছে। অন্যদিকে রাধাকান্ত দেবের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ ১৮৫৬ সালের ১৭ই মার্চ বিধবা বিবাহের আইন যাতে না পাশ হয় সেজন্য প্রায় ৩৩০০ জনের স্বাক্ষর সহ আবেদন পত্র জমা করেন। শেষ পর্যন্ত গ্র্যান্ড সাহেবের সহায়তায় ১৮৫৬ সালের ১৩ই জুলাই 'বিধবা বিবাহ' আইন পাশ হল। যা '১৮৫৬ সালের ১৫ই আইন' নামে প্রসিদ্ধ হল। বিদ্যাসাগরের নামে সমস্ত বাংলা তথা ভারতবর্ষে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। বিদ্যাসাগরের নামে গান রচিত হল 'বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে'।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখের অপেক্ষা রাখে, বিশ শতকের সাহিত্যে ছদ্মনাম গ্রহণের প্রবণতা বেড়েছে, ছদ্ম নামের আড়ালে নিজেকে গোপন করার মানসিকতার পাশাপাশি যুক্ত হয়েছিল কোন নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে জগৎ ও জীবনকে দেখার সচেতন প্রয়াস। প্রমথ চৌধুরীর 'বীরবল', রাজশেখর বসুর 'পরশুরাম', সমরেশ বসুর 'কালকূট' ইত্যাদি ছদ্ম নাম গ্রহণে জগৎ

ও জীবনকে নতুন দৃষ্টিতে দেখার প্রবণতা মুখ্য হয়ে উঠেছে। উনবিংশ শতাব্দিতে বঙ্কিমচন্দ্রও মুখ্যত একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে জগৎ ও জীবনকে দেখার প্রবণতা থেকেই 'কমলাকান্ত' চরিত্রটি সৃষ্টি করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ছদ্মনাম গ্রহন করে ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত যেখানে আপাত সংসার বিমুখ, সমাজের অসংগতিগুলোকে দেখেন ও বোঝেন কিন্তু তাকে সংশোধন করার দায় এড়িয়ে চলেন ; সেখানে বিদ্যাসাগর সমাজের অন্যায় অসংগতির সত্যরূপ উন্মোচন করে সমাজপতি তথা সমাজের সংস্কার সাধন করেন। বঙ্কিমের কমলাকান্ত সংসার বিমুখ, আফিংখোর, পাগল, সমাজ বিচ্ছিন্ন। তার কথায় ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ আছে কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত 'পাগলে কিনা বলে, ছাগলে কিনা খায়' গোছের আপ্ত বাক্যে কমলাকান্তকে সকলে হয় করুণা বা অবহেলা করে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বনামে ও ছদ্ম নামে 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোষ্য', 'কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ' 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোষ্য সহচরস্য' ছদ্ম নামে 'অতি অল্প হইল,' 'আবার অতি অল্প হইল', 'ব্রজবিলাস', 'রত্নপরীক্ষা' পুস্তিকা গ্রন্থগুলিতে তাঁর স্বকালে বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে সমাজ পতি তথা তথাকথিত স্বার্থান্বেষী পন্ডিতদের অনৈতিক বিধানের প্রতিবাদ করে সমাজকে সঠিক দিশা দেখিয়ে ছিলেন।

তাই গৃহস্থে ,নগরে, গ্রামে বিদ্যাসাগরের নামে বিজয়ধ্বনি ঘোষিত হল । বিধবাগন পুনরায় সংসার জীবনের স্বপ্ন দেখে বিদ্যাসাগরকে আশীর্বাদ দান করলেন । তিনি সেকালে বিধবাদের জন্য নির্দিষ্ট মাসোহারা বা ভাতা ব্যবস্থা প্রচলন করে ছিলেন। আজ একবিংশ শতাব্দিতে বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের প্রাচীন সিন্ধুক থেকে প্রাপ্ত সেই নথী তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। শুধু আইন প্রনয়ণই নয় - ১২৬৩ বঙ্গাব্দের ২৪শে অগ্রহায়ণ সর্বপ্রথম মহা সমারোহে কলকাতার সুকিয়া স্ট্রীটে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে বিধবা কালিমতী দেবীর বিবাহ সম্পন্ন হয়। কিশোরী চাঁদ মিত্রের মতে - 'আমাদের দেশের ইতিবৃত্তে নবযুগের প্রারম্ভ।'(যদি চিনি যদি জানিবারে পাই)। ১২৬৩ সালে ২৫শে অগ্রহায়ণ মাসে নদীয়ার কৃষ্ণমোহন বিশ্বাসের সঙ্গে কলকাতার ঈশানচন্দ্র মিত্রের বিধবা কন্যা থাকমনি দাসীর বিবাহ হয়, ঐ সালেই রামসুন্দর ঘোষের বিধবা কন্যা গোবিন্দমনি দাসীর সঙ্গে ২৪পরগনার দুর্গানারায়ণ বসুর বিবাহ এবং পর পর বিধবাদের বিবাহে সমাজে বৈধব্যের মরাগাঙ্গে বিদ্যাসাগর জীবনের জয়তরী ভাসিয়ে দিলেন।।

আজ এই আন্দোলনের কথা গুলো দু-শত বছর পরে আমরা গল্পের মতো হয়তো শুনে তৃপ্ত হচ্ছি, কিন্তু বিদ্যাসাগর কে এই কঠিন পথ বহু প্রতিকূলতা প্রতিবন্ধকতা জয় করে করতে হয়েছে। সাহিত্যের ছাত্র মাত্রই জানেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই বিধবা বিবাহ প্রবর্তন নীতিবাগীশ বঙ্কিমচন্দ্র-ও সমর্থন করেন নি। 'বিষবৃক্ষে' বলেছিলেন - 'ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে নাকি বড় পন্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবা বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পন্ডিত হয়, তবে মূর্খ কে ?'[১২] কিন্তু বিদ্যাসাগরের অদম্য সাহস ও চরিত্রের অনমনীয় দৃঢ়তার কাছে সব প্রতিবন্ধকতা দূর হয়।।

আজ একবিংশ শতাব্দীতে বসে ভাবতে অবাক লাগে বিদ্যাসাগর একক মহীমায় সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা, সংস্কৃতি, নারী প্রগতি, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি ভারতীয় সমাজ আন্দোলন কে শুধু নিয়ন্ত্রণই করেন নি সমাজ মনে জ্ঞানের ও প্রেমের সঠিক দিশা দেখিয়ে ছিলেন।। বাঙ্গালী জাতি যতদিন থাকবে বিদ্যাসাগরের অবদান উত্তরোত্তর কালে আরো প্রাসঙ্গিক ভাবে প্রতীয়মান হবে। কিন্তু মূঢ় অশিক্ষিত বর্বর লোক সমাজে তখনো ছিল, যারা বিদ্যাসাগরের গায়ে কালিমা লেপন করতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। আজও তাদের দেখা যায় ঐ একই কর্মে লিপ্ত হতে না হলে মেট্রোপলিটন ইনশটিটিউশন যা বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালি দরিদ্র ছাত্রদের জন্য নিজ হাতে গড়ে তুলেছিলেন, তাদের স্বাধীন ভাবে উচ্চ শিক্ষা ও ইংরাজী শিক্ষা দানের জন্য যাতে সমাজের আবিলতা দূর হয়। ন্যায় শিক্ষায় সমাজকে এই প্রতিষ্ঠানে তিনি বর্ণপরিচয় দান করেছিলেন; ঐ প্রতিষ্ঠান যা

আজ 'বিদ্যাসাগর কলেজ' নামে প্রশিদ্ধ, সেই কলেজেই সম্প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ভুলুণ্ঠিত হতে হয়েছে কিছু হীন, ক্ষুদ্রমতী, রাজনৈতিক ব্যবসায়ীর হাতে। এর থেকে বাঙ্গালি জাতির বড় অভিশাপ আর কি হতে পারে ? সমস্ত বাঙ্গালি জাতির আজ লজ্জায় মরমে অবনত হওয়া উচিৎ ঐ মহামানবের পদতলে। তবেই হয়তো ঐ চরম পাপের খানিকটা প্রায়শচিত্ত হতে পারে। আমাদের বিশ্বাস তাদের অসৎ উদ্দেশ্য অচিরেই নষ্ট হবে ।। বিদ্যাসাগর আমাদের অন্তরে ও শিরোপরে সর্বদা থাকুন, আমরা ওনার কীর্তি শুনে ও বলে যদি সমাজের আঙ্গিনায় কোনো মুক্ত বায়ু প্রবাহিত করতে পারি তবে আমাদের জীবন ধন্য হবে ।

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার দু-এক পংক্তি দিয়ে আমার 'সাগর তর্পন' এখানে সমাপ্ত করি

'তেমন মানুষ না পাই যদি খুঁজব তবে হায়
ধুলায় ধূসর বাঁকা চটি ছিল যা ওই পায়
সেই যে চটি উচ্চে যাহা উঠত এক এক বার
শিক্ষা দিতে অহংকৃতে শিষ্ট ব্যবহার ।

শাস্ত্রে যারা শস্ত্র গড়ে হৃদয় বিদারণ
তর্ক যাদের অর্কফলার তুমুল আন্দোলন
বিচার যাদের যুক্তবিহীন অক্ষরে নির্ভর
সাগরের এই চটি তারা দেখুক নিরন্তর ।
দেখুক এবং স্মরণ করুক সব্যসাচীর রণ
স্মরণ করুক বিধবাদের দুঃখ মোচন পণ
স্মরণ করুক পান্ডা রুপী গুন্ডাদিগের হাত
বাপ মা বিনা দেবতা সাগর মানেই নাকো আর।

অদ্বিতীয় বিদ্যাসাগর মৃত্যু বিজয় নাম
ঐ নামে হায় লোক করেছে অনেক ব্যর্থ কাম'। ১৩

অনুসরণে ঃ

১) বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিবাস - শম্ভু চন্দ্র বিদ্যারত্ন - চিরায়ত প্রকাশন - ডিসেম্বর ২০০৮ - পৃ - ১৯
২) তদেব - পৃ - ৭
৩) তদেব - পৃ - ১৭
৪) বিদ্যাসাগর চরিত - চারিত্র পুজা - রবীন্দ্র রচনাবলী - একাদশ খন্ড - অগাষ্ট - ১৯৮৯
৫) করুণা সাগর বিদ্যা সাগর - ইন্দ্র মিত্র - আনন্দ - অক্টোবর ২০০৯- পৃ - ২৮
৬) বিদ্যাসাগর চরিত - চারিত্র পুজা - রবীন্দ্র রচনাবলী - একাদশ খন্ড - অগাষ্ট - ১৯৮৯
৭) যদি চিনি যদি জানিবারে পাই - শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় - গ্রন্থ মিত্র - ডিসেম্বর ২০০৯ - পৃ - ৩০৮
৮) বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিবাস - শম্ভু চন্দ্র বিদ্যারত্ন - চিরায়ত প্রকাশন - ডিসেম্বর ২০০৮ - পৃ - ৪৫
৯) যদি চিনি যদি জানিবারে পাই - শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় - গ্রন্থ মিত্র - ডিসেম্বর ২০০৯ - পৃ - ৩০৯
১০) তদেব - পৃ ৩০৮
১১) বিষবৃক্ষ - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - বঙ্কিম উপন্যাস সমগ্র - সম্পাদক কাঞ্চন বসু - রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন - কল -৯
১২) কাব্য সঞ্চয়ন - সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত - এম.সি. সরকার এন্ড সন্স - ১৯৬০ - পৃ ২৫-২৬

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১) বিদ্যাসাগর রচনাবলী - ১ ও ২ - তুলিকলম - সম্পাদনা- তীর্থপতি কর - সেপ্টেম্বর ১৯৯৪
২) সেকাল আর একাল - রাজনারায়ন বসু - চিরায়ত প্রকাশন - কল - ৭৩ - জানুয়ারী ২০০৮
৩) উনিশ শতকের বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতি - স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী - পুস্তক বিপণী - নভেম্বর ২০০৩
৪) উনিশ শতকের বাংলা - সম্পাদনা অলোক রায়, গৌতম নিয়োগী - পারুল প্রকাশনী - ২০১৩
৫) সেই প্রথম পুরুষ - নীলকণ্ঠ ঘোষাল - প্রতিভাস - জানুয়ারী ২০১১
৬) রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ - শিবনাথ শাস্ত্রী - নিউএজ - ১৯৮৩